মানকর কলেজ

মানকর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

****

শিক্ষাসামগ্রী (Study Material)

বিষয়	বাংলা
শ্রেণি	স্নাতক (সাম্মানিক)
সেমেস্টার	ষষ্ঠ **(VI)**
কোর্স কোড	**DSE-4** (2)
শিরোনাম	লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য (প্রাথমিক ধারণা)

পাঠক্রম (Syllabus)

- লোকসংস্কৃতি কি ?
- লোকসংস্কৃতির শ্রেণিবিভাগ
- লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- উপকরণ – ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসংগীত, লোকনাট্য, মন্ত্র
- ময়মনসিংহ গীতিকা

রচয়িতা / Prepared by:

ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক (স্নাতকোত্তর)
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মানকর কলেজ
মানকর, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

মুঠোফোন - ৯৮৩৬০৯২৯১৪
৯৭৪৯৭৮২৯৫১
ই-মেল - ab3mankarcollege@gmail.com
arijitcomplit@gmail.com

১.১ লোকসংস্কৃতি কি ?

'লোক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Folk'। ঐতিহাসিকভাবেই লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ ও চর্চার সূত্রপাত ঘটে ইউরোপ মহাদেশে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপে লোক বলতে মনে করা হত মূলত গ্রামীণ নিরক্ষর কৃষকদের, যাদের সমাজব্যবস্থার নিয়মকানুন, রীতিনীতি, প্রথা, শিল্পকলা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে মৌখিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে, অর্থাৎ যাঁদের জীবনধারায় ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাপকাঠিতে এই লোক-এর সামাজিক অবস্থান ছিল একদিকে আদিম সমাজব্যবস্থার 'অ-সভ্য' ও 'অ-সংস্কৃত'। নিজস্ব অভিজাত সংস্কৃতির সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধানী ইউরোপীয় গবেষকরা তাঁদের আগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন লোক-এর ওপর, যদিও তাঁদের যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল লোক-এর স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ক্ষীয়মান হতে হতে বিলুপ্ত হবে গ্রামিক লোকসমাজ। অতএব এর যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

'সংস্কৃতি'-র সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা রয়েছে। E. B. Tylor-এর মতে –

'that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'

আবার অন্যভাবেও বলা হয়েছে যে সংস্কৃতি হল পরিবেশের মানব-নির্মিত অংশ। মার্ক্সীয় অভিধায় তা হল সমাজে অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে নির্মিত উপরিকাঠামো। এই উপরিকাঠামোর প্রেরণাতেই মানুষ তরবারির শুধুমাত্র তীক্ষ্ণতাতেই সন্তুষ্ট থাকে না, তাকে করে তোলে মণিরত্নখচিত। সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর এতই অন্তর্ভেদী যে এদের কাউকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা আবার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের জীবনধারাকে।

'লোক' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটিকে যুক্ত করলে পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতি শব্দসমষ্টি, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Folklore' এবং শব্দটি ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে প্রথম ব্যবহার করেন William John Toms ।ইউরোপে লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত আগ্রহের সূচনাকাল ষোড়শ শতক হলেও আধুনিক চর্চা শুরু হয় জার্মানিতে Grimm ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক লোককথা সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে। একদিকে লোকসংস্কৃতি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচায়ক এবং অন্যদিকে তা অধ্যয়নযোগ্য শাস্ত্র।

লোকসংস্কৃতিবিদ Dan Ben-Amos-এর মতানুযায়ী –

'Folklore is artistic communication in groups'

অর্থাৎ লোকসমাজের অভিজ্ঞতা, সৃজনশীল কল্পনা, রীতিনীতি, অতীত ও বর্তমানের পরম্পরার এক সুষমামণ্ডিত নান্দনিক বার্তা-বিনিময় ঘটে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। লোকউৎসব, ব্রত, পাঁচালি, কথকতা, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির সমস্ত উপাদানই সমাজ-সম্পৃক্ত এবং এদের সংশ্লিষ্ট আছার-আচরণসমূহ কোন নির্দিষ্ট লোকসমাজের পরম্পরা অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয় বহন করে। জাতিগত ও আঞ্চলিক পার্থক্য প্রতিটি লোকসমাজের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, এককথায় সমগ্র জীবনধারাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তোলে। লক্ষণীয় যে, একই দেশের একাধিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটা সামগ্রিক ঐক্যচেতনার স্থান থাকলেও লৌকিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের অনন্যতার পরিচায়ক। তাই লোকসংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে স্থান-কালের প্রেক্ষিতেই তা করতে হয়। মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের মতে, লোকসংস্কৃতি শ্রমজীবি মানুষের সৃষ্টি ও তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার।

১.২ লোকসংস্কৃতির শ্রেণিবিভাগ

লোকসংস্কৃতির প্রবাহে লোক-লোকায়ত জীবনধারার সামগ্রিকতাই প্রতিফলিত হয় বিভিন্নরূপে ও ভাবে। অর্থাৎ লোকজীবনধারার সামগ্রিক প্রয়াস ও প্রতীতি এবং প্রাণময় ও কর্মময় যাবতীয় অভিব্যক্তিই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির পঞ্চপ্রধান অভিব্যক্তি নিম্নরূপ –

ক) বস্তুপ্রধান

খ) ভাবপ্রধান

গ) কার্যকারিতা প্রধান

ঘ) অনুষ্ঠান প্রধান

ঙ) শিল্প প্রধান

লোকসংস্কৃতির প্রধানত দুটি রূপ আছে। প্রথমটির আত্মপ্রকাশ গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনধারাকে ঘিরে। নিত্যব্যবহার্য তৈজস, আসবাব ছাড়াও সামাজিক উৎসব, লোকাচার এই পর্যায়ভুক্ত। লোকসংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারাটি পাওয়া যায় লোকসমাজের ব্যক্তিচেতনার সমষ্টিগত রূপকে। এই পর্যায়ে পড়ে লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকচিত্র। প্রকাশমাধ্যমের বিভাজন অনুযায়ী লোকসৃষ্টির দুটি প্রধান শাখা –

ক) মূর্তিমান সংস্কৃতি (Material Culture)

খ) বাক্-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি (Formalised Culture)

মূলত ভাষা নিরপেক্ষ মানুষের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা সৃষ্ট বস্তুসামগ্রীই মূর্তিমান সংস্কৃতি। আর ভাষাশ্রয়ী ভঙ্গিনির্ভর শিল্পগুণ সমন্বিত সৃষ্টিশীল বিষয়সমূহই বাক্-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র বিষয়সমূহকে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ানুবন্ধনে নিম্নলিখিত প্রধান পাঁচটি ধারায় বিন্যস্ত করা যায় –

ক) দৈহিক ক্রিয়াধর্মী (ক্রীড়া, অভিনয়, ইঙ্গিত, নৃত্য-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি)

খ) শিল্পধর্মী (কারুকর্ম-চারুশিল্প, গৃহস্থাপত্য-আসবাবপত্র, পোশাক-যানবাহন, ব্যবহারিক উপকরণ, রান্নাবান্না)

গ) বাক্-ধর্মী (ভাষা, লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, গীত, গাথা, ইত্যাদি)

ঘ) প্রয়োগধর্মী (মন্ত্রগুপ্তি, ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা, ঔষধপত্র, তাবিজ, কবচ, ইত্যাদি)

ঙ) বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী (জাদু-ক্রিয়াচার, ধর্ম-লোকাচার, পালা-পার্বণ, সংস্কার, পূজানুষ্ঠান, উৎসব, মেলা, ইত্যাদি)

১.৩ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

নিরক্ষর সমাজে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যই লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। অর্থাৎ, নান্দনিক অনুভূতি ও ব্যবহারিক প্রয়োজন এ দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান হল লোকসাহিত্য, যা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল একান্তভাবেই মৌখিক তথা ‘oral-literature’। এটি বংশপরম্পরায় প্রবাহিত থেকেছে নানান প্রকরণের মধ্যে দিয়ে। লোকসাহিত্য শুধু গ্রামীণ মানুষেরই সাহিত্য নয়, খেটে খাওয়া নাগরিক জীবনের অংশীদারও এই সাহিত্যের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। আসলে ‘লোক’ তথা সাধারণ মানুষের জীবনকথার অতিপ্রকাশকেই লোকসাহিত্য বলা যেতে পারে। তবে সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে সেই সাহিত্যকেই লোকসাহিত্য বলা যেতে পারে যা ঐতিহ্যের দীর্ঘ পরম্পরার অবিভাজ্য অংশ হিসেবেই প্রজন্মানুসারে মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়ে থেকেছে অতীত থেকে বর্তমান অবধি। ফলত লোকসাহিত্যের সীমানার বিস্তৃতি অনেকদূর অবধি। সৃষ্টি রহস্যের কথা, সমাজবিবর্তনের সূত্র, প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কার-রীতিনীতি, মিথ, কাহিনি, কিংবদন্তি সবই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত উপবর্গগুলি –

ক) লোককথা

খ) ছড়া

গ) ধাঁধা

ঘ) প্রবাদ

ঙ) প্রবচন

চ) গীতিকা

১.৪ (ক) উপকরণ – ছড়া

লোকসাহিত্যের একটি অতি প্রাচীন প্রকরণ হল ছড়া। সভ্যতার আদিলগ্নে দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করা হত ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে। সেই সব আদি মন্ত্রই পরে প্রাথমিকভাবে ছড়ায় বিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। তবে ছড়ায় মন্ত্রের মতো ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গটি প্রায় বিলুপ্তই বলা যায় – পরিবর্তে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবনা এতে প্রতিফলিত হয়।

ছড়া মূলত দুই ধরনের –

ক) সর্বজনীন

খ) ছেলেভুলানো

সর্বজনীন ছড়ার যে গঠনকাঠামো রয়েছে সেটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ব্রত, খেলাধূলা, এমনকী বিয়ের নাপিতের ছড়াও। এছাড়া বাঘ-তাড়ানো বা ভূত-তাড়ানোর মন্ত্রও ছড়ার আকারেই তৈরি হয়।

ছেলেভুলানো ছড়ায় সামাজিক ও পরিচিত পারিবারিক জীবনের অভিভব সর্বাধিক তাই শিশুরাও ভালো করে কথা বলতে শেখার আগে ছড়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তবে এর আরেকটা বড় কারণ হল ছড়ার অন্তর্লীন ছন্দোস্পন্দন। এই নিবেদন বৈশিষ্ট্যই সম্ভবত ছড়াকে সবচেয়ে জনপ্রিয় মৌখিকশিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

১.৪ (খ) উপকরণ – প্রবাদ

প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয় *'wit of one, wisdom of many'*। যে-কোনো প্রবাদই বহুকালের বহুজনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিস্মৃত পরিচয় কোনো একজন মানুষের বাচনে স্বরূপধারণ করে। প্রায় সব প্রবাদের নেপথ্যেই কোনো একটি ঘটনা বা কাহিনি থাকে, যাকে উপলক্ষ করে বহুজনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়। যেহেতু মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তন সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক উর্দ্বতনের ছক সারা বিশ্বেই একইভাবে গড়ে উঠেছে-তাই

অনুরূপ অভিজ্ঞতা কিংবা একই অন্তর্কাঠামো সম্পন্ন অভিজ্ঞতার নিরিখে, সারা পৃথিবীতে একই রকমের উপলব্ধির অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রবাদের মধ্যে। এই জন্যে প্রবাদ একান্তভাবেই একটি বিশ্বজনীন বাক্-শিল্প।

১.৪ (গ) উপকরণ – ধাঁধা

ধাঁধা হল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার, যার মূল উপকরণ দৈনন্দিন জীবনের ও সমাজের নানান উপাদান। ধাঁধার মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়। ধাঁধার মধ্যে একটা সাদাসিধে ভঙ্গি থাকে এবং অপ্রত্যাশিত বা অভাবিত কোনো কিছুর তুলনা বা উপমা এর মধ্যে রূপকাশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সাদৃশ্য ও আপাত-বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে সুপ্রাচীন কাল থেকে ধাঁধা অনগ্রসর এবং অগ্রসর উভয় সমাজেই গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ লোক সমাজে এর প্রচলন থাকলেও নাগরিক সমাজে এর ব্যবহার ক্রমক্ষীয়মাণ। গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, কল্পিত অলৌকিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস, বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা, সামাজিক আনন্দ ও ধর্মাচার, লোকাচার, ইত্যাদি নানান কারণে ধাঁধার ব্যবহার হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে সুন্দর সুন্দর অনেক ধাঁধা আছে। এক শুকপাখি যখন ব্যাধের দ্বারা ধৃত হয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হয়েছে, তখন ঐ শুকপাখি রাজাকে কিছু ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে ও তার উত্তর জানতে চায়। যেমন –

তরুণ নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন।।

উত্তর।। দাবানল

১.৪ (ঘ) উপকরণ – লোকসংগীত

গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে যে গান বা সংগীত মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখেই প্রচার লাভ করে তাকেই সাধারণত লোকসংগীত বলা হয়। বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে লোকসংগীতের ধরন ও প্রকৃতির বিভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, চটকা, জ্যাগ; মধ্যবঙ্গের আলকাপ, ছেঁচরা, বোলান, পাঁচালী; পূর্ববঙ্গের ঘাটু, ভাটিয়ালি; পশ্চিমবঙ্গের ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, সাখী, বাঁধনা, পটুয়ার গান, ইত্যাদি।

বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও মূল বক্তব্য বা আবেদনের ক্ষেত্রে এর অভিন্নতা লক্ষ করার মতো। যেমন, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের ঘাটু আর পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সুরে গীত হলেও এর অভিন্ন বিষয়বস্তু – প্রেম; সেকারণে এদের আবেদন সর্বজনীন। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন, মালদহের গম্ভীরা কিংবা মুর্শিদাবাদের আলকাপ অন্য কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না।

বাংলা লোকসংগীতের সুরকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – সারি ও ভাটিয়ালি। যে সুরে দ্রুত কিংবা ধীর তাল ব্যবহৃত হয় তাকে সারি শ্রেণিভুক্ত করা যায়। নৃত্য সংবলিত গানই সারির পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে দীর্ঘ টানের মধ্য দিয়ে একবার চড়ায় উঠে পর মুহূর্তেই খাদে নেমে আসার বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সুরই ভাটিয়ালি। মানুষের মুখে মুখে লোকসংগীতের যাত্রা শুরু হলেও কালের বিবর্তনে অনেক কবি গীতিকার প্রাতিষ্ঠানিক লোকসংগীত রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাদের রচিত গানে সুর সংযোজন করেও অনেক সুরকার সুনাম কুড়িয়েছেন।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বহু সুর-সংগীতকার লোকসংগীতের ধারা অবলম্বন করে এমনকি আধুনিক গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গানে এই লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

পল্লী বাংলায় আর এক শ্রেণির লোকসংগীতের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুভূতি থেকে রচিত ও গীত বলে অনেকে একে সর্বজনীন সংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না। কারণ তাদের মতে এই শ্রেণির গানে সুরের আবেদন থাকলেও বক্তব্য বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও গ্রামবাংলায় এর আবেদন সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ। বাউল, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব এই পর্যায়ভুক্ত। বাংলার লোকসংগীত সাধারণত নানা প্রকার তারযন্ত্র সহযোগে গীত হয়।

১.৪ (ঙ) উপকরণ – লোকনাট্য

লোকনাট্যের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত মেলেনি। তবুও আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি যে, লোকেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকেদের জন্য অভিনীত, লোকেদের দ্বারা আদৃত, মূলত লোক বিষয়ক যে নাটক তাই হলো লোকনাট্য। পৌরাণিক চরিত্র বা বিষয়ও লোকনাট্যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিতে লৌকিক হয়ে ওঠে।
লোকনাট্য সুস্পষ্টভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। তবে বিস্মৃত হলে চলবে না যে লোকনাট্যের উৎসবের বিচারে মূলত আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য হল সেইগুলো যেগুলো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে নাট্যের অভিনয় হয়। অপর পক্ষে অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্যের কোনো বিশেষ উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। লোকনাট্যের উদ্ভব ধর্মীয় লোকউৎসব থেকে। সাদৃশ্যমূলক ও অনুকরণাত্মক

জাদুক্রিয়ার ভূমিকা লোকনাট্য সৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কোনো অনুকরণাত্মক জাদুক্রিয়া অভিনয় গুণ সমৃদ্ধ। তাছাড়া কুলপ্রতীকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটিও লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

পরিশীলিত নাটকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লোকনাট্যের স্বরূপ সন্ধান করতে পারি।

পরিশীলিত নাটক	লোকনাটক
১। পরিশীলিত নাটক এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি	১। লোকনাট্য মূলত খণ্ডচিত্র রূপেই উপস্থাপিত
২। পরিশীলিত নাটকে আদ্যন্ত দৃঢ়ভাবকে রক্ষা করা হয়	২। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যই হলো শৈথিল্য
৩। পরিশীলিত নাটকের প্রথমাবধিই লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশ	৩। লোকনাট্যের মৌখিক রূপ লভ্য এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত
৪। পরিশীলিত নাটক নির্দিষ্ট অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত	৪। লোকনাট্যে তেমনভাবে অঙ্ক বা দৃশ্যে বিভক্ত নয়
৫। পরিশীলিত নাটকে যন্ত্রসংগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রাদির সেখানে অগাধ ব্যবহার। তাছাড়া অত্যাধুনিক যান্ত্রিক কলাকুশলতার সহায়তাও গ্রহণ করা হয় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে।	৫। লোকনাট্যের হারমোনিয়াম, জুড়ি, মন্দিরা, বাঁশি এই ধরনের সীমিত সংখ্যক কয়েকটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বাদ্যযন্ত্রেরই ব্যবহার ঘটে।

১.৪ (চ) উপকরণ – মন্ত্র

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গে মন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতির অংশ মন্ত্রের ব্যবহার পালা-পার্বণ, সংস্কার, পূজানুষ্ঠান, উৎসব, প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় যে,

" মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্র উদাহৃতঃ। "

অর্থাৎ, যার মননের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, সংসার সাগর থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে, তাকেই মন্ত্র বলে। মন্ত্রের ব্যাপক অর্থ মনসংযোগ।

বৈদিক ধ্বনি বা শব্দকে ছন্দের মধ্যে নিয়ে দেব-দেবীর স্তুতি বা হোম কাজ করার নিশ্চিতরূপ শব্দ বিধান এই মন্ত্র। কোরান শরিফের আয়াতকেও মন্ত্র বলা হয়। এই মন্ত্র বহু প্রকার। যদিও সকল মন্ত্রের উদ্দেশ্য এক। মন্ত্রের বীজের মধ্যে আমাদের জীবনের লক্ষ ও প্রাপ্তির উপায় নিহিত আছে। সাধারণত মন্ত্রের মধ্যে তিনটি অংশ থাকে-

ক) প্রণব

খ) বীজ

গ) দেবতা

প্রণব সর্ব্বব্যাপী ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশ করে, বীজ ব্যষ্টি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করে। দেবতা সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায় জানিয়ে দেয়। বটের বীজে যেমন একটা পূর্ণ পরিণত ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হবার শক্তি নিহিত, মন্ত্রের বীজের মধ্যেও সেইরূপ বিশিষ্ট জীবের পূর্ণ পরিণতি লাভের শক্তি নিহিত আছে।

১.৫ ময়মনসিংহ গীতিকা

যে কোন সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। একটি মৌখিক ধারা, অপরটি লেখ্য ধারা। যে সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি, মানুষের মুখে মুখেই ব্যাপ্তি এবং লোক মুখে মুখেই লোক থেকে লোকান্তরে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়ে থাকে, আধুনিক সংজ্ঞায় তাকেই লোকসাহিত্য বলে। লৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রেম-ভালোবাসা এসবই লোকসাহিত্যের মূল বিষয়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ লোকসাহিত্যের এক সমৃদ্ধ আধার। আর এই লোকসাহিত্যের অনন্য এক দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকা। যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে বাংলার লৌকিক জীবনের এক একটি অনন্য উপাখ্যান। শাশ্বত মানবিক চেতনার গৌরব গাঁথা পড়ে সবাই বিস্মিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায় সবার।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ভূমিকার শেষে যে তারিখ দিয়েছেন তা হলো '২৪শে নভেম্বর, ১৯২৩'। পাশাপাশি ইংরেজি গদ্যে গীতিকাগুলির যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন সেগুলি 'Eastern Bengal Ballads – Mymensingh' (Vol. 1, Part 1) নামে গ্রন্থাকারে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে '23rd September, 1923' তারিখ প্রদত্ত। এর থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজি সংস্করণটিই আগে প্রকাশিত।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলির পরিচয় –

ক্রম	গীতিকার নাম	রচয়িতা	যাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত
০১	মহুয়া	দ্বিজ কানাই (বন্দনা গীতিটি জনৈক মুসলমান গায়েনের রচিত)	ক। মসকা গ্রামের সেক আসক আলী খ। মসকা গ্রামের উমেশচন্দ্র দে গ। গোরালীর নসু সেক
০২	মলুয়া	'বন্দনা' অংশে চন্দ্রাবতীর নাম আছে। (মূল	ক। পদমশ্রী গ্রামের পাষাণী বেওয়া

		গীতিকাটির চন্দ্রাবতীর রচনা কিনা সে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের সন্দেহ ছিল।)	খ। রাজীবপুরের সেক কাঞ্চা গ। মঙ্গলসিদ্ধির নিদান ফকির ঘ। খুরশীমলীর সাধু ধুপী ঙ। সাউদ পাড়ার জামালদি সেক চ। দুলাইল-এর মধুর রাজ ছ। পদমশ্রী গ্রামের দুখিয়া মাল
০৩	চন্দ্রাবতী	নয়ানচাঁদ ঘোষ	অজ্ঞাত
০৪	কমলা	দ্বিজ ঈশান	কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসিনী তিন-চারজন রমণীর কাছ থেকে।
০৫	দেওয়ান ভাবনা	অজ্ঞাত	ক। কৈলাসচন্দ্র দাস খ। কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের কাছ থেকে
০৬	দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী	অজ্ঞাত
০৭	রূপবতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
০৮	কঙ্ক ও লীলা	দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া	অজ্ঞাত
০৯	দেওয়ান মদিনা	মনসুর বয়াতি	অজ্ঞাত

এই গীতিকাগুলির সাহিত্য মূল্য অপরিসীম। গীতিকাগুলি মূলত নায়িকা প্রধান এবং অধিকাংশই প্রণয়মূলক। এতে গ্রামীণ প্রেমের বর্ণনা অপূর্ব রোমান্টিকতায় বর্ণিত। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির অপূর্ব সম্মিলন পাওয়া যায়। যা চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার পরিচয় বহন করে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের এই নানাবিধ সংস্কৃতি ব্যক্তির সৃষ্টি ও সমষ্টিগত পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় চিরচলমান। বাংলার লোকসাহিত্যের চর্চায় ময়মনসিংহ গীতিকার গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

****

শিক্ষার্থীরা লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে পাঠের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারে –

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য – *বাংলার লোকসাহিত্য*

২। মানস মজুমদার – *লোকসাহিত্য পাঠ*

লোক ঐতিহ্যের দর্পণে

৩। বিনয় ঘোষ – *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*

৪। মযহারুল ইসলাম – *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন*

৫। ওয়াকিল আহমদ – *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (প্রভৃতি)